দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ...08 DEC 1998...
পৃষ্ঠা ...১২... কলাম ...৩...

নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে লড়াই

মাগুরায় এক জনসভায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষণা করেছেন, আমাদের এখন ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জিততে হবে। বলাবাহুল্য, একটি সত্যিকার স্বাধীন দেশে ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতার অভিশাপ থাকা উচিত নয়। নির্দিষ্ট একটি সময়কালের মধ্যে তা দূর করতেই হবে। চলতি বছরের ১৪ জুনে জনকণ্ঠের প্রধান শিরোনামাধীন প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০০৬ সালের মধ্যে দেশ নিরক্ষরমুক্ত হবে। অনুসন্ধানী প্রতিবেদনটিতে বলা হয়েছিল, ১৯৯০ সাল থেকে শুরু করে প্রাথমিক পর্যায়ে ছাত্রছাত্রী ভর্তি যে হারে বাড়ছে, তা অব্যাহত থাকলে ২০০৬ সালের মধ্যে দেশ নিরক্ষরমুক্ত হবে। '৯০ সালে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক ঘোষণার পর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তির হার আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে। '৯৬ সালে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর বছরান্তে শিক্ষার্থী ভর্তির হার কয়েক লাখ বৃদ্ধি পায়। তারপরও বিশ্বব্যাংকের হিসাবে, এখনও ৬ থেকে ১০ বছর বয়সী শতকরা ১৫ ভাগ শিশু শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। আমরা যেখানে অচিরেই একুশ শতকে পদার্পণ করতে চলেছি, সেখানে নিরক্ষরতার এই হার বড় একটি বাধা হয়ে দাঁড়াবে–একুশ শতকেও আমরা এ অবস্থা নিয়ে ঠিক আধুনিক রাষ্ট্রের চাহিদা মেটাতে পারব না। নিরক্ষরতা দূর করার তাগিদটা বলা যায় সেদিক থেকেই আরও তীব্র হয়ে উঠেছে।

সাক্ষরতার কয়েকটি কার্যক্রম সরকার হাতে নিয়েছে। এর একটি হচ্ছে সমন্বিত অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্প (ইন্টিগ্রেটেড নন-ফরম্যাল এ্যাডুকেশন প্রোজেক্ট, সংক্ষেপে ইনফেপ)। ১৯৯১ সালে গৃহীত এ প্রকল্পে প্রায় চল্লিশ লাখ মানুষকে সাক্ষর করা হয়েছে–মূল লক্ষ্য যা ছিল তার তিনগুণ।

সে সাফল্য দেখেই সরকার '৯৬ সালে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদফতর (ডিরেক্টরেট অব নন-ফরম্যাল এ্যাডুকেশন বা ডিএনএফই) প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেয়। আগামী ২০০৫ সাল নাগাদ এই অধিদফতর আমাদের একটি সাক্ষর জাতি উপহার দেয়ার দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে। এর পাশাপাশি ডিএনএফই সমর্থিত সিবিএ (সেন্ট্রালি বেজড এ্যাপ্রোচ) নামে আরেকটি কার্যক্রমও নিরক্ষরতা দূরীকরণে নিয়োজিত রয়েছে, সেটি পরিচালনা করে থানা প্রশাসনের সহযোগিতায় দেশের বিভিন্ন এনজিও।

আশপাশের যেসব দেশেই নিরক্ষরতা দূর করা সম্ভব হয়েছে বা সাক্ষরতা অর্জনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, সব ক'টিতেই নিরক্ষরতা দূরীকরণকে পরিণত করা হয়েছে একটি সামাজিক আন্দোলনে। সেটিই এ আন্দোলনকে সফল করার মূল শক্তি ও চাবিকাঠি। ভারতের কেরালা রাজ্যে শতকরা এক শ' ভাগ সাক্ষরতা অর্জিত হয়েছে এভাবেই। পশ্চিমবঙ্গেও সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি পেয়েছে একইভাবে। এছাড়া শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ, মালয়েশিয়া, ভিয়েতনাম প্রভৃতি দেশে সাক্ষরতার উল্লেখযোগ্য হার অর্জনের পিছনে সামাজিক আন্দোলনের ভূমিকাই প্রধান। আমাদের দেশে ব্র্যাক, প্রশিকাসহ প্রধান কয়েকটি এনজিও সাক্ষরতার হার বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছে। আর সরকারীভাবে সর্বাত্মক সাক্ষরতা আন্দোলন, বিশেষ করে বর্তমান সরকারের আমলে কীভাবে বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে জোরদার হয়ে উঠছে তা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। এর ফলেই মাগুরাকে সম্ভব হয়েছে একটি নিরক্ষরমুক্ত জেলা হিসাবে ঘোষণা করা। ঐ ঘোষণার জন্য আয়োজিত স্থানীয় স্টেডিয়ামেই প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, অতীতের মতো ঐক্য ও দেশপ্রেমের চেতনা নিয়ে ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমাদের জিততে হবে।

অবশ্য মাগুরার মতো প্রতীকী সাফল্য বিগত সরকারের আমলেও দুয়েকটি ক্ষেত্রে অর্জিত হয়েছে। সে সাফল্য নিয়ে আত্মতুষ্টি বা আত্মপ্রসাদ লাভের খুব একটা অবকাশ নেই।

দারিদ্র্য ও ক্ষুধাই আমাদের নিরক্ষরতা দূর করার পথে বড় রকম বাধা এবং সে বাধা সর্বশক্তি দিয়ে দূর করতে হবে। এটা বোঝার জন্য আমাদের দৈনন্দিন ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের অভিজ্ঞতাই যথেষ্ট। আমাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার কারণেই বিস্তীর্ণ গ্রামবাংলায় এবং শহরাঞ্চলেও স্বল্পবিত্ত ও দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে মেয়েদের তো আদৌ বা বেশিদূর লেখাপড়া শেখানো হয়ই না, ছেলেদেরও প্রধানত অর্থনৈতিক কারণেই বেশি লেখাপড়া শেখানোটা এখনও অর্থের অপচয়ই মনে করা হয়। সংসার চালানোর জন্য কাজের হাত কমে যাবে, এই ধারণার বশবর্তী হয়ে ছেলেদের স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে শৈশবেই অর্থোপার্জনের ঘানিতে জুড়ে দেয়া হয়। এভাবেই প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতেই ড্রপআউটের সংখ্যা এখনও অনেক বেশিই থেকে যাচ্ছে। অধীত শিক্ষা বা জ্ঞান চর্চার অভাবে ভুলে যেতে সময় লাগে না এবং এর ফলে সমাজে নিরক্ষর মানুষের সংখ্যা কার্যত বাড়তেই থাকে। বিগত আমল থেকেই সরকারীভাবে শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী গৃহীত হয়েছে, কিন্তু সাম্প্রতিক পর্যালোচনাতেও দেখা গেছে, সে কার্যক্রম এখনও সফল করা যায়নি। বিশ্বব্যাংক, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস) ও জাতীয় শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে সম্প্রতি এ কর্মসূচীকে ব্যর্থ আখ্যায়িত করে বিকল্প কোন প্রকল্প গ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছে।

পত্রিকান্তরে সম্প্রতি প্রকাশিত এক তথ্য হচ্ছে, গত ৩১ আগস্ট মাগুরা জেলার সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলনের সমাপ্তি ঘটেছে। তার আগে গত ২৭ আগস্ট স্থানীয় প্রেসক্লাবে মাগুরা জেলা মানবাধিকার কমিশন আয়োজিত 'শিশুশ্রম ও মানবাধিকার' শীর্ষক সেমিনারে জেলা প্রশাসক মাগুরাকে নিরক্ষরমুক্ত এলাকা ঘোষণা করেন। তিনি সেখানে দৃঢ়ভাবে একটি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে বলেন, 'যদি কেউ এর মধ্যে নিরক্ষর লোক আমার সামনে হাজির করতে পারে, তবে প্রত্যেক নিরক্ষর লোক হাজির করার জন্য তাকে ১০০ টাকা করে পুরস্কার দেয়া হবে।' এ চ্যালেঞ্জের একটি ইতিবাচক দিক অবশ্যই আছে। তবে আসল কাজটি হচ্ছে, নিরক্ষরতাবিরোধী অভিযানকে গোটা সমাজে ছড়িয়ে দেয়া এবং সে অভিযানে সকল সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনকে শামিল করা। আশার কথা, মাগুরা জেলা প্রশাসকের ঐ ঘোষণার স্বল্পকাল পরেই দেশের শীর্ষ পর্যায় থেকে সেখানে নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জয়লাভের অত্যন্ত উদ্দীপনাময় ঘোষণা দেয়া হয়েছে। আমরা প্রধানমন্ত্রীর সে ঘোষণাকে আন্তরিকভাবেই স্বাগত জানাই এবং দেশবাসীর প্রতি তাঁর আহ্বান ও দৃঢ় সঙ্কল্পে ইতিবাচক সাড়া দেয়ার জন্য জোর তাগিদ প্রদান করছি। দেশকে গড়ে তোলা এবং প্রার্থিত উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য সাক্ষরতা ও শিক্ষা বিস্তারের বিকল্প নেই।